সূচীপত্র

ভূমিকা	৯
কোটা আন্দোলনের পটভূমি	১৩
১৪ জুলাই রোববার	১৮
১৫ জুলাই সোমবার	১৯
১৬ জুলাই মঙ্গলবার	২১
১৭ জুলাই বুধবার	২৪
১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার	৩১
১৯ জুলাই শুক্রবার	৩৪
২০ জুলাই শনিবার	৩৭
২১ জুলাই রোববার	৩৯
২২ জুলাই সোমবার	৪১
২৩ জুলাই মঙ্গলবার	৪৫
২৪ জুলাই বুধবার	৪৬
২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার	৪৮
২৬ জুলাই শুক্রবার	৫০
২৭ জুলাই শনিবার	৫৪
২৮ জুলাই রোববার	৫৬
২৯ জুলাই সোমবার	৫৮
তোমাদের স্বাধীনতায়	৫৯
৩০ জুলাই মঙ্গলবার	৬২
৩১ জুলাই বুধবার	৬৩
১ আগস্ট বৃহস্পতিবার	৬৯
২ আগস্ট শুক্রবার	৭৫
৩ আগস্ট শনিবার	৭৮
৪ আগস্ট রোববার	৮১
৫ আগস্ট সোমবার	৮৭
৬ আগস্ট মঙ্গলবার	৯৬
৭ আগস্ট ২০২৪	১০৩
৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার	১০৬
বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিস্তারিত	১০৯
৯ আগস্ট শুক্রবার	১১৬
১০ আগস্ট শনিবার	১২৫
১১ আগস্ট রোববার	১২৮
১২ আগস্ট সোমবার	১৩১
১৩ আগস্ট মঙ্গলবার	১৩৬
১৪ আগস্ট বুধবার	১৩৭
১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার	১৪২
শেষাংশ	১৪৬
কৃতজ্ঞতা ও দায় স্বীকার	১৬০

ভূমিকা

বদলে যাওয়া এক বাংলাদেশের সাক্ষী হলাম আমরা, ইতিহাসের আই উইটনেস। অভাবনীয় একটি দিন। ৩৬ দিনের রক্তাক্ত পথ ধরে অবশেষে বিজয়ের দিন, ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জয়। ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পটপরিবর্তনকে কেউ বলছেন বিপ্লব, কারো ভাষায় গণজাগরণ। অনেকে আবার বলছেন জনরোষ, ছাত্র-জনতার যে রোষের আগুনে পতন হলো টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের।

ছাত্রদের একটি দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে ১ জুলাই আন্দোলনে নামেন ছাত্ররা। অহিংস একটি আন্দোলন, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আর সরকারি দলের পোষ্য ছাত্রলীগের হামলা, নির্যাতন আর গুলিতে প্রবল হয়ে ওঠে ছাত্রদের আন্দোলন। তাদের ওপর সহিংসতার মাত্রা যত বাড়তে থাকে, ততই অগ্নিময় হয়ে ওঠে আন্দোলন। পতন ঘটে দীর্ঘ ১৬ বছর ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনা সরকারের।

যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছাত্রদের। দুই হাজার বছর আগে ১৬০ খ্রিষ্টাব্দে চীনের ইমপেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী আন্দোলনের কথা আজও আমরা স্মরণ করি। বাংলাদেশের ইতিহাসও তরুণদের আত্মত্যাগের মহিমা দিয়েই লেখা।

১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু' ঘোষণার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন ছাত্র-জনতা, বুকের রক্ত দিয়ে বায়ান্নে তারা ছিনিয়ে এনেছিলেন মায়ের ভাষা বাংলা, ১৯৬৯ সালে ছাত্ররা আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর মহান মুক্তিযুদ্ধে তো তাদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নব্বইয়ে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে স্বৈরাচার হটিয়েছিলেন ছাত্ররাই। ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুলশিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মানুষ। ন্যায্য দাবিতে ন্যায়ের আন্দোলন

ছাত্রদের, ফলে তা হয়ে ওঠে আগ্নেয়গিরির মতো, তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মতো তাতে একাত্ম হয়ে ওঠেন সর্বস্তরের মানুষ। সেই প্রবল শক্তিকে রোখার সাধ্য আছে কোন স্বৈরশাসকের!

ইতিহাস বড় নির্মম, ইতিহাস ভুল পথে চলে না। একটি যৌক্তিক দাবি নিয়ে ছাত্ররা যখন রাজপথে, তাকে শক্তি ও শাস্তির মাধ্যমে দমনের অপচেষ্টা করল শাসকগোষ্ঠী। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর চলল নির্যাতন, গুলি, গুম। উত্তাল হয়ে উঠল আন্দোলন। যোগ দিলেন স্কুল-কলেজ-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, তাদের বাবা-মা, চাকুরে, ব্যবসায়ী, গৃহিণী... সবাই। ছাত্রদের আন্দোলন হয়ে উঠল ছাত্র-জনতার আন্দোলন।

২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের ভোটারবিহীন নির্বাচন, ক্ষমতার প্রতাপ, দম্ভ, স্বজনপ্রীতি, প্রতিটি সেক্টরে সীমাহীন দুর্নীতি, মন্ত্রী-এমপি-আমলার আর গুটিকয়েক শিল্প-পরিবারের হাজার কোটি টাকা লুটপাট, অর্থপাচার, টেন্ডারবাজি, সরকারি অফিসে ঘুষ-বাণিজ্য, বাজার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে লাগামহীন দ্রব্যমূল্য... জনগণের যত অভিযোগ, ক্ষোভ যোগ হতে থাকে কোটার দাবির পাশে।

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ নূর হোসেন দেশের গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন।

৩৪ বছর পর তেমনই রংপুরে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বুক পেতে দাঁড়ান, প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। আজ আমরা যে দেশটা পেলাম, সেই বাংলাদেশে আবু সাঈদ, মুগ্ধ, রিয়ার মতো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রাণ উৎসর্গকারী প্রত্যেকে একেকজন নূর হোসেন। তাদের রক্তের দামে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যুক্ত হয় কমপ্লিট শাটডাউন, ব্লকেড, লংমার্চের মতো অপ্রতিরোধ্য ঢেউ। দেশ অচল, রাজধানীজুড়ে গুজব। যাত্রাবাড়ী, রামপুরা, মিরপুরে কেবলই লাশের গন্ধ...।

মাত্রই এমন বাস্তবতা পেরিয়ে এলাম আমরা। আমাদের চোখে দেখা এই সব দিনরাত্রি নিয়ে লেখা হবে অজস্র কবিতা, গল্প, স্মৃতিকথা। এসব ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হিসেবে চিরকাল বিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যতে এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নানা মাত্রার বিচার-বিশ্লেষণও চলবে।

মেসবাহ য়াযাদ একজন লেখক ও সাংবাদিক। সফল সংগঠকও। দুরন্ত, দুঃসাহসী এবং অনুসন্ধানী মন তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। পেশাগত কাজ এবং হৃদয়ের টান—দুই সমান সত্যকে নিয়ে আন্দোলনের পুরোটা সময় তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন রাজধানীর পথে

পথে। দেখেছেন প্রাণের উচ্ছ্বাস, সাক্ষী হয়েছেন প্রাণ বিসর্জনের মতো বেদনাদায়ক ঘটনার। মেসবাহ য়াযাদের সেই সব অভিজ্ঞতা—দেখার চোখ থেকে লেখার হাত হয়ে গ্রন্থিত হয়েছে 'চব্বিশের বাংলাদেশ' বইয়ে। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, অবশেষে বিজয় নিয়ে এটিই বোধ করি প্রথম গ্রন্থ। মেসবাহ য়াযাদের এই কষ্টকর প্রয়াস অনেকটাই হ্যান্ডনোটের মতো। পড়তে পড়তে পাঠক পাবেন ভাবনার জগৎ, ফিরে যেতে পারবেন সেই উত্তাল দিন-ক্ষণে। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

আন্দোলনের অনিশ্চিত দিনগুলোতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেসবাহ য়াযাদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। জোগাড় করেছেন নির্মোহ বিশ্লেষকদের তাৎক্ষণিক লেখা ও প্রতিক্রিয়া। 'চব্বিশের বাংলাদেশ'-এ সে সবই মলাটবন্দি। সময়ের সাহসী দলিল এ গ্রন্থটির জন্য শুভকামনা আর প্রত্যাশা—ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আজ আমাদের সামনে, তা যেন সত্যি হয়। আমাদের দেশটা হোক দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ।

—গিয়াস আহমেদ

লেখক ও সাংবাদিক

কোটা আন্দোলনের পটভূমি

বাংলাদেশে সব ধরনের সরকারি চাকরিতে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন হয়েছে মোট তিনবার। ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে।

২০১৩ সালের জুন-জুলাই বাংলাদেশে প্রথম কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়। এটি ছিল দেশের সরকারি খাতে চাকরিসংক্রান্ত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ আন্দোলন প্রথমে শাহবাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এটি ২০১৩ সালে ঢাকার শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভের সমসাময়িক একটি আন্দোলন, যেটি প্রায় একই সময়ে একই স্থানে হয়েছিল। তবে ২০১৩ সালের কোটা আন্দোলন সফলতার মুখ না দেখলেও এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশে পুনরায় কোটা নিয়ে বড় ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয়।

২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল সব ধরনের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে। ১৯৭২ সাল থেকে চালু হওয়া কোটাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে, চাকরিপ্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এ আন্দোলন করে। লাগাতার এ আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকার।

২০২৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্ট বাতিলকৃত কোটা পুনরায় বহাল করে। যার ফলে ২০২৪ সালের ৬ থেকে ১০ জুন প্রথম পর্যায়ে মোট পাঁচ দিন আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০ জুন ২০২৪ থেকে আন্দোলন শুরু করলে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় দেশে সব ধরনের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে। কোটা আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হয়ে পড়ে রাজধানীর শাহবাগ ও ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে যোগ দেয় বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

২০২৪ সালের ১ জুলাই কোটা আন্দোলনের সময় 'কোটা সংস্কার আন্দোলন'-এর পরিবর্তে এর নাম 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ঘোষণা করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ৮ জুলাই ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। যার মধ্যে ছিল ২৩ জন সমন্বয়ক এবং ৪২ জন সহসমন্বয়ক। আন্দোলনের পরিধিক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার পর ৩ আগস্ট সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক দল গঠন করে। যার ৪৯ জন সমন্বয়ক এবং ১০৯ জন সহসমন্বয়ক।

শিক্ষার্থীরা দাবি করে, ২০১৮ সালের সরকারি পরিপত্রকে বেআইনি ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারি চাকরিতে পূর্বেকার কোটাব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে। দেশের সকল সরকারি চাকরিতে কোটার সংখ্যা হ্রাস করার দাবিতে এ সময় শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। তারা অবস্থান কর্মসূচি, রেললাইন অবরোধ, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের সময় ঘটে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আপিল বিভাগ ১০ জুলাই ২০২৪ সালে কোটা ইস্যুতে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থার আদেশ দেন।

লাগাতার আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দমন-পীড়ন, সশস্ত্র ও সহিংস হামলার শিকার হয়। পুলিশ রাবার বুলেট, ছররা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিপেটা করে বিভিন্ন সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এতে আন্দোলনের আগুনে ঘি পড়ে। আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে সব ধরনের সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে নীতিগত সমর্থন দেয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ জাসদ (নুরুল-আম্বিয়া), হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

অপর পক্ষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ। এ ছাড়া সরকারের নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বাংলাদেশ আনসার বাহিনী।

১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। একই দিন

দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের ওপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়।

একই সাথে পুলিশও লাঠি, রাবার বুলেট, টিয়ার শেল দিয়ে হামলা করে। প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরাও তাদের দিকে ইটপাটকেল ছুড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এসব ঘটনায় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আহত হওয়ার পাশাপাশি ২০৯ জনের অধিক নিহত হয় এবং পুলিশ ৫০০ মামলা করে। ৯ হাজারের অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বছরের ২১ জুলাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করেন এবং সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। ২৩ জুলাই এ বিষয়ে সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে (১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট) ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৯ হাজারেরও বেশি। তাদের মধ্যে রয়েছে ছাত্র, জনতা, পুলিশসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ সময় ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা-দুর্ঘটনা। আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গুলি, হত্যা, ৮ দফা, ৯ দফা, সব শেষে শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা; কারফিউ, সহিংসতা, গণবিক্ষোভ; শেখ হাসিনার পতন, ভারতে আশ্রয় নেওয়া এবং নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার—সব মিলিয়ে ২০২৪ সালের মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট জুড়ে টালমাটাল বাংলাদেশ!

এত অল্প সময়ে যে এত কিছু ঘটতে পারে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের অতি আত্মবিশ্বাস এবং আন্দোলনকে খাটো করে দেখার কারণেই তাদের এই করুণ পরিণতি হয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, শেখ হাসিনার পদত্যাগে সবকিছুর পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় শেখ হাসিনার প্রতি দেশের সর্বস্তরের মানুষের অনাস্থা।

শেখ হাসিনার প্রতি মানুষের এত অনাস্থার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও পরপর তিনবার (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) যেনতেনভাবে নির্বাচন করে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সব কিছু করেন শেখ হাসিনা। যেটি 'সাধারণ মানুষ' একেবারেই পছন্দ করেনি। এই সময়ে মানুষের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। মামলা-হামলা

ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সত্যিকারের মনের কথা লেখার স্বাধীনতা হারিয়েছিল দেশের মানুষ। কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করলে, মুখ খুললে তার প্রতি পুলিশের নির্যাতন-নিপীড়ন-মামলা চলত। সব মিলিয়ে দেশ যেন ছিল এক পুলিশি রাষ্ট্র, বৃহৎ কারাগার!

আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৫ বছরে যতই উন্নয়ন করুক, একদিকে বিপুল পরিমাণ শিক্ষিত বেকার এবং তাদের কর্মসংস্থানের অভাব, অন্যদিকে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, লুটপাট, টাকা পাচার, উচ্চ মূল্যস্ফীতি—এসব কারণে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ ছিল।

সে ক্ষোভ প্রকাশ করার সুযোগ ছিল না। ভোট দেওয়ার সুযোগ না থাকার ফলে মানুষের ভেতরে সেই ক্ষোভ ভয়াবহভাবে বাড়তে থাকে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এসব ক্ষোভের পাশাপাশি শেখ হাসিনার প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা তৈরি হয়েছিল এবং সেটা ২০১৮ সালেই চূড়ান্তভাবে বেড়েছিল।

২০১৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে তরুণরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল। ওই বছরের ২৯ জুলাই রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দর সড়কে দ্রুতগতির দুই বাসের সংঘর্ষে রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী রাজীব ও দিয়া নিহত হয় ও ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা কার্যকর সড়ক নিরাপত্তার দাবিতে ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত গণবিক্ষোভ করে।

সে সময় আওয়ামী লীগ তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সে আন্দোলনকে দমিয়ে রাখে। সরকার আশ্বাস দিয়েও ছাত্রদের দাবিগুলো আর মানেনি। তখন থেকেই ছাত্রদের মধ্যে শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। ২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবি ২০১৮ সালের সেই অনাস্থা ও অবিশ্বাসেরই চূড়ান্ত ফল।

২০২৪-এ যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, সরকার ছাত্রদের কোনো কথাই শোনেনি। তারা একদিকে আদালতের দোহাই দিয়ে সময়ক্ষেপণ করে, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের আক্রমণ করে। এবার শুরু থেকে সরকার একের পর এক ভুল করতে থাকে। এটা সত্যি যে, তারা তরুণদের ভাষা বুঝতে চায়নি, বুঝতে পারেনি।

সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারফিউ দেয়। বন্ধ করে দেয় ইন্টারনেট, ফেসবুক। এগুলোর কারণে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ আরও বাড়ে।

কারফিউ শেষে সরকার নিহত ছাত্রদের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে উল্টো মায়াকান্না করে সরকারি স্থাপনা নিয়ে। এসব মেনে নিতে পারেনি এ প্রজন্ম। এসবের প্রেক্ষিতেই কোটা সংস্কার আন্দোলন আগস্টের শুরুতে রূপ নেয় এক দফায়—শেখ হাসিনার পদত্যাগ।

ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকার দেয়ালগুলো ভরে ওঠে বিপ্লবী স্লোগানে আর বর্ণিল গ্রাফিতিতে। গ্রাফিতির মাধ্যমে নানা দাবিও তুলে ধরা হয়। দেয়াললিখন ও গ্রাফিতিতে স্থান পায় ছাদে গিয়ে গুলিতে নিহত ছোট্ট রিয়াসহ যারা মারা গেছে তাদের নাম। মৃত্যুর আগে মুগ্ধর স্নিগ্ধ হাসিতে বলা 'পানি লাগবে পানি?' শোভা পায় দেয়ালজুড়ে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে জুলাই মাস শেষে আগস্ট আসেনি। 'জেন জেড'-এর ভাষায় ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) দেশ দ্বিতীয়বারের মতো আবারও স্বাধীনতা পায়। সে তারিখটিই তুলির আঁচড়ে দেয়ালে লিখে রাখে তারা।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও সেই সাম্যের বাংলাদেশ গড়ে ওঠেনি। নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনে সামরিক এরশাদ সরকারের পতনের পর নির্বাচনের মাধ্যমে বারবার ক্ষমতার পালাবদল হলেও সত্যিকারের গণতন্ত্র আর সুশাসন আসেনি। বরং যখন যে ক্ষমতায় গেছে, সেই স্বৈরাচারী আচরণ করেছে।

তাই এবার শিক্ষার্থীরা শুধু কোটা নয়, সব ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তি চেয়েছে। ২০২৪ সালের ১ জুলাই শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনের নাম দেয় 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'।

লক্ষণীয় বিষয় ছিল, এবারের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও রাস্তায় নেমেছে। তরুণ প্রজন্ম বলছে, তারা এমন বাংলাদেশ চায়, যেখানে বৈষম্যের বদলে সবার জন্য সমান সুযোগ থাকবে।

একজন মাঠের সংবাদকর্মী হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নিজের চোখে দেখার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি পাঠকদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

এটি সময়ের একটি প্রামাণ্য দলিল।

সময়কাল ১৪ জুলাই ২০২৪ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪ সাল।

এতে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে ব্রিটিশ শাসনামল, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, এক-এগারো, ২০১৩, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন।

১৪ জুলাই রোববার

শুরুতে আন্দোলন সভা-সমাবেশের মধ্যে স্থির থাকলেও চীন থেকে ফিরে ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে 'চাকরিতে কোটা সুবিধা মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা না পেয়ে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে' বলে মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ১৪ জুলাই মধ্যরাতে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, পরে জাহাঙ্গীরনগর, সিলেটের শাহজালাল ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে। এরপর দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে রাস্তায় নেমে পড়ে। তারা ব্যঙ্গ করে 'তুমি কে, আমি কে—রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার', 'চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার' ইত্যাদি স্লোগান দেয়।

ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের একটি অংশের 'তুমি কে আমি কে—রাজাকার, রাজাকার' নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছাত্ররা অবশ্য বলছে, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তারা এমন স্লোগান দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমগুলোতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অনেকে বলেছে, কোটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যের প্রতিবাদে তারা মধ্যরাতে বিক্ষোভ করেছে।

জুলাই মাসের শুরু থেকে টানা আন্দোলন ও বাংলা ব্লকেড নাম দিয়ে অবরোধের মতো কর্মসূচি চালিয়ে যায় তারা। এ কর্মসূচির কারণে কয়েক দিন শহরে তীব্র যানজট তৈরি হয় এবং মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪ জুলাই আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি দেয়। এ স্মারকলিপিতে সংসদের অধিবেশন ডেকে কোটা সংস্কারের দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয় আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা এ সময়ের মধ্যে তুলে নেওয়ারও দাবি জানায় তারা।

১৫ জুলাই সোমবার

১৪ তারিখ রাতে শিক্ষার্থীদের 'রাজাকার' স্লোগান দেওয়া মেনে নিতে পারেননি ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। শিক্ষার্থীরা কেন নিজেদের রাজাকার বলেছে, এই ক্ষোভে-অভিমানে তিনি একটি লেখা লেখেন। যে লেখার শেষাংশ ছিল—

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে, আমি মনে হয় আর কোনদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইবো না। ছাত্র-ছাত্রীদের দেখলেই মনে হবে এরাই হয়তো সেই রাজাকার!

আর যেই কয়দিন বেঁচে আছি—আমি কোনো রাজাকারের মুখ দেখতে চাই না। একটাইতো জীবন। সেই জীবনে আবার কেনো নতুন করে রাজাকারদের দেখতে হবে?'

ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালের লেখার প্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ প্রায় সব মূলধারার গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয়। শাবিপ্রবিতে তাকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন অনলাইন বুকশপ তার কোনো বই বিক্রি না করার ঘোষণা দেয়। বিভিন্নভাবে তাকে বয়কটের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থী ও সমর্থকরা।

এদিন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের ওপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়।

সরকারি দলের লোকজনের সঙ্গে যোগ দিয়ে পুলিশও লাঠি, রাবার বুলেট দিয়ে হামলা করে। প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় বেশ কিছু শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আহত হয়। এদিন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের লোকজন, ছাত্রলীগ ও পুলিশের